এইচএসসি পরীক্ষার ফল : আত্মতুষ্টি না আত্ম-অনুশোচনা

২৩ জুলাই ২০১৯ ০০:০০
আপডেট: ২৩ জুলাই ২০১৯ ০০:১৯

গত ১ এপ্রিল ২০১৯ সালে শুরু হওয়া এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল (১৭ জুলাই ২০১৯) দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রকাশ নিঃসন্দেহে দেশের শিক্ষা প্রশাসনের সাফল্যকে নির্দেশ করে। কেননা এতে শিক্ষার পরবর্তী স্তর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং ক্লাস শুরুর যে সিস্টেম জট (যা শিক্ষার্থীদের জীবনে সিস্টেম লস হিসেবে পরিগণিত করা যায়) রয়েছে, তা কমানো সম্ভব হবে। একই সঙ্গে বিষয়টি আমাদের শিক্ষা প্রশাসনের গতিশীলতাকেও নির্দেশ করে। তার পরও কোথায় যেন একটি ভুল রয়ে গেছে যার কারণে এক-চতুর্থাংশেরও বেশি শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত কিনা তা যাচাই করা হয়। এটা কেবল তাদের ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচনের পথনকশাই এঁকে দেয় না, দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হওয়ার দুয়ারও উন্মুক্ত করে দেয়। তাই এইচএসসির ফল প্রকাশের পর বিভিন্ন গণমাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের যে ছবি প্রকাশ হয় তা আমাদের মাঝে জ¦ালিয়ে দেয় আশার আলো।

এরাই আগামী দিনে এ দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এ ভাবনা আমাদের মাঝে স্বস্তি এনে দেয়। বিগত বেশ কয়েক বছর মাত্রাতিরিক্তি জিপিএ-৫ ও পাসের হারের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতি ঘটলেও শিক্ষার্থীদের কাক্সিক্ষত যোগ্যতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হওয়ায় গত বছর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়েছিল এবং দেখা গিয়েছিল ফলাফল বিপর্যয়। আগে যেখানে আশি শতাংশেরও বেশি পাস করত সেখানে গত বছর করেছে মাত্র ৬৬.৬৪ শতাংশ। গত বছরের তুলনায় এ বছর অবশ্য পাসের হার বেড়েছে। এ বছর পাসের হার ৭৩.৯৩ শতাংশ। ফলে শিক্ষার্থী, অভিভাবক থেকে শুরু করে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বেশিরভাগ মানুষের মাঝেই এক ধরনের পরিতৃপ্তি লক্ষ করা গেছে।

advertisement

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মান ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে যাচ্ছে। এতদিন শিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যাগত প্রবৃদ্ধি ঘটলেও এখন গুণগত মানের দিকেও আমরা নজর দিতে পারছি। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রীতিমতো ঘটে গেছে বিপ্লব যা বিশ্বের বহু দেশের কাছে অনুকরণীয়। সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ে ভর্তির হার শতভাগ, ছাত্রছাত্রীর সমতা, নারী শিক্ষায় অগ্রগতি, ঝরে পড়ার হার দ্রুত কমে যাওয়াসহ শিক্ষার অধিকাংশ ক্ষেত্রই রোল মডেল এখন বাংলাদেশ। তবে প্রদীপের নিচে যেমন অন্ধকার থাকে, তেমনি এই সাফল্যের মাঝেও আছে কিছু ব্যর্থতা। যেমন এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২৬.০৭ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করতে পারেনি। এ বছর ৯ হাজার ৮১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ১৩ লাখ ৫১ হাজার ৫০৫ পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে ৯ লাখ ৯৯ হাজার ১৬৮ জন পাস করলেও ফেল করেছে ৩ লাখ ৫২ হাজার ৩৩৭ জন। এই যে বিশালসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ফেল করেছে এটা কিন্তু হেলাফেলা করার মতো কোনো বিষয় নয়। একবারও কী কেউ ভেবে দেখেছেন, এতে রাষ্ট্রের কত অপচয় হলো। আমরা বিষয়টিকে আরও গভীরভাবে অনুসরণের জন্য এইচএসসি ফলাফলকে শিক্ষার ফাংশনাল বিশ্লেষণে ফ্যাক্টরি মডেল দ্বারা দেখার চেষ্টা করেছি। আধুনিককালে মানব পুঁজিতত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষায় রাষ্ট্রের ব্যয়কে বিনিয়োগ হিসেবে দেখা হয়। যদিও এই বিনিয়োগ থেকে লাভ আসতে সময় বেশি লাগে, তার পরও সরাসরি শিল্পে বিনিয়োগ থেকে শিক্ষায় বিনিয়োগ অধিক লাভজনক বলে বিশ^ব্যাপী স্বীকৃত। কিন্তু এবারের ফলাফলকে ফ্যাক্টরি মডেল অনুযায়ী ইনপুট-প্রসেস-আউটপুট ফ্রেমওয়ার্কে ব্যাখ্যা করলে, আউটপুট হচ্ছে ফলাফল। ১২ বছরের বিনিয়োগের পর যদি কোনো ফ্যাক্টরিতে প্রায় ২৬ ভাগ সিস্টেম লস হয়, অর্থাৎ প্রডাকশন রেট ৭৫ শতাংশ হয়, তা হলে মালিকপক্ষ এই বিনিয়োগে কি আনন্দিত হতে পারে? এটা তো বড় ধরনের ক্ষতি হিসেবে দেখা হয়। তেমনি শিক্ষার্থীদের পেছনে ১২ বছর বিনিয়োগ করার পরও যদি দেখা যায়, বিনিয়োগকৃতদের ২৫ ভাগ এইচএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য, শিখনফল অর্জন করতে ব্যর্থ, নিঃসন্দেহে শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে প্রকাশ করে। এটা বড় ধরনের একটি অপচয়। শিক্ষার অপচয় একটি জাতির উন্নতির পথে অন্তরায়। অথচ প্রতিবছরই আমরা দেখি প্রায় এক-তৃতীয়াংশের মতো ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় যা শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় ধরনের অপচয়ই কেবল নয়, এটা শিক্ষার গুণগত মানকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচনী ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চেয়ে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর হতে পারে না।' প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ থিওডোর শুলজও শিক্ষায় বিনিয়োগের রেট অব রিটার্ন যে অন্য যে কোনো বিনিয়োগের চেয়ে উৎকৃষ্ট হয় তা দেখিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যাও এ ব্যাপারটি বেশ ভালোভাবেই জানেন। তাই তো তার শাসনামলে শিক্ষায় উত্তরোত্তর বাজেটের আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা হলো পুঁজি যতই বিনিয়োগ করা হোক না কেন, যদি তা যথাযথভাবে কাজে লাগানো না হয়, তবে তা পুঁজির অপচয়। এই যে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে তা যে কত বড় অপচয় তা একটু খোলাসা করা যাক। রাষ্ট্র প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকে নানাভাবে। তা সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী হোক কিংবা বেসরকারি কলেজের হোক। শিক্ষার্থীরা যদি অকৃতকার্য হয় তবে তা রাষ্ট্রের অর্থের অপচয়। এই অপচয়কে অর্থে প্রকাশ করলেও ১২ বছরের ক্রমযোজিত হিসেবে কয়েক বিলিয়ন টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। অপরদিকে কোনো শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে পারিবারিক আর্থিক অপচয় যেমন হয়, তেমনি শিক্ষার্থীর হয় সময়ের অপচয়। তা ছাড়া অকৃতকার্য হলে শিক্ষার্থী, অভিভাবকরা যেমন মানসিক কষ্ট পান, তেমনি সমাজেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অনেকে অকৃতকার্য হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয় কিংবা মাদকাসক্তিসহ বিভিন্ন খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। এসব কিছুই কিন্তু পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নতির পথে অন্তরায়।

তাই এই পরীক্ষার এই ফলাফলকে ঘিরেই শিক্ষা নিয়ে নতুন করে ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেন এত বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হলো। ছাত্রছাত্রীরা পিইসি, জিএসসি ও এসএসসির মতো তিনটি পাবলিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েই এইচএসসি পরীক্ষায় বসার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তা হলে অবশ্যই তাদের এটাতেও কৃতকার্য হওয়ার সামর্থ্য রয়েছে। তবে কেন তারা পারল না। অনেকেই বলবেন, উঠতি বয়সি ছেলেমেয়েরা ঠিকমতো পড়ালেখা করেনি, ফাঁকি দিয়েছে, ফেসবুকসহ নানাভাবে সময়ের অপচয় করেছে। মাত্র দুবছরের কলেজ জীবনে শিক্ষার্থীরা তাদের সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেনি, তাই ফেল করেছে। এগুলো অবশ্যই গুরুতর কারণ। তবে প্রধান কারণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় গুণগত মানের ঘাটতি। এই ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে নানাবিধ কারণে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হার, কাঠামোবদ্ধ তথা সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন এবং সেই অনুযায়ী পাঠদানে শিক্ষকদের দুর্বলতা, অবকাঠামোগত সমস্যা, শিক্ষা উপকরণের ঘাটতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আবাসন সুবিধার সমস্যা, নোট ও গাইড বই নির্ভরশীলতা, শিক্ষার্থীদের ক্লাসবিমুখিতা, প্রতিকূল শিক্ষাঙ্গন পরিবেশ, পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য বিবেচনা না করে উপস্থাপনসহ মানের ঘাটতি, পারিপ¦ার্শিক চাপে নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন সমস্যা শিক্ষার্থীদের খারাপ ফলাফলের কারণ। কলেজগুলোতে তীব্রভাবে রয়েছে শিক্ষক সংকট। সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক সংকট ও শিক্ষকদের গাফিলতি শিক্ষার্থীদের খারাপ ফলাফলের জন্য যেমন দায়ী, তেমনি বেসরকারি কলেজগুলোর অনেক শিক্ষকের যোগ্যতা ও দক্ষতার ঘাটতিও এই খারাপ ফলাফলের জন্য দায়ী।

এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ৯০৯টি প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া সব শিক্ষার্থীই পাস করলেও ৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থী পাস করতে পারেনি। পরিসংখ্যানের আলোকে শিক্ষায় বিনিয়োগের দৃষ্টি থেকে ব্যাখ্যা করলে, মাত্র ১০.১২ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে ১০০ শতাংশ রিটার্ন পাওয়া গেছে এবং ০.৪৬ শতাংশ ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। তা হলে প্রশ্ন, আমরা এরূপ লস বিনিয়োগ কেন করছি? কেন বিনিয়োগের আগে বিবেচনা করছি না? আর বিনিয়োগ যখন করছি, তখন মনিটরিং করছি না কেন? শিক্ষায় অপচয় এবং দুর্নীতি এ ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। আবার শিক্ষা বিষয়ে ন্যূনতম ধারণা বা পড়াশোনা ছাড়া ব্যক্তিদের এই প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত করাও এই অপচয়কে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। মনে রাখতে রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা বা অন্য যে কোনো অধ্যয়নের ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাও একটি বিশেষায়িত বিষয়। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা ডিগ্রিধারীদের না বসালে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না।

আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যাগত প্রবৃদ্ধি আশানুরূপ করতে পারলেও এখনো গুণগত মান নিশ্চিত করতে পারিনি। এজন্য দরকার দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষক, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কঠোর তদারকি ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সমস্যাগুলোর আশু সমাধান।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বের ভবিষ্যৎ এগারোটি উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তির একটি বাংলাদেশ। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলে এবং শিক্ষার অপচয় হ্রাস করতে না পারলে এই ভবিষ্যৎ মিথ্যা হয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশকে ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। শিক্ষা এসডিজির চার নম্বর লক্ষ্যমাত্রা হলেও একে ঘিরেই সবগুলো আবর্তিত হয়। এজন্য শিক্ষার অপচয় রোধ করতে হবে। আর এই অপচয় রোধ করার উপায় হচ্ছে শিক্ষার গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধান করার মাধ্যমে পাবলিক পরীক্ষায় শতভাগ পাসের সাফল্য অর্জন করা। তাই এবারের এইচএসসির পাসের হার দেখে আত্মতুষ্টি নয়, বরং আত্ম-অনুশোচনা করে কীভাবে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করে শতভাগ পাসের সাফল্য অর্জন করে শিক্ষার অপচয় রোধ করা যায় সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়াটাই হবে যুক্তিসঙ্গত। নতুবা সরকারের পরিকল্পিত ভিশন-২০৪১ অর্জন সম্ভব হবে না।

য় ড. মাহবুব লিটু : চেয়ারম্যান, বিশেষ শিক্ষা বিভাগ এবং ছাত্র-উপদেষ্টা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়;

এবং আরিফুর রহমান : প্রভাষক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, রাজশাহী বিশ^বিদ্যালয়